অজিত চৌধুরী

পোস্ট মডার্নিজম এবং আমি

এক

পোস্ট মডার্নিজম বিষয়ক একটি সাদামাটা প্রবন্ধ লিখতে চাইছি। সহজ ভাষায়, যেন রামকৃষ্ণ কথামৃত।
অথচ পোস্ট মডার্নিজম বিষয়ে আমার পড়াশুনো খুব কম, নেই বললেই চলে, কয়েকটি বই উল্টেপাল্টে দেখেছি। পোস্ট মডার্নিজম : আমার হাসি পেল। প্রতিপাদ্যগুলো আমার কতদিনের চেনা-জানা, লিপিবদ্ধ করা, ওরা এখন আমার কথাগুলোই বলছে, একটু বিকৃতভাবে, মডার্নিজমের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে আমার কথাগুলো ফিরে আসছে আমারই কাছে। পোস্ট মডার্নিজম বিষয়ক গ্রন্থগুলো পড়ার কোনো তাগিদ আমি অনুভব করি না, কেননা ওই সকল গ্রন্থগুলি আমারই লেখা। আমি এখন আমার কয়েকটি প্রতিপাদ্য আর একবার রাখব, পোস্ট মডার্নিজমের মোড়কে, তোমার কাছে। যুবক, শোন। এখনই তো শোনার সময়, যখন আমাদের মাথার উপর ভেঙে পড়ছে আকাশ এবং ঈশ্বরের হাড়গোড়।
অতএব এটি প্রিয় গায়ত্রীদি বা ডেরিডার পোস্ট মডার্নিজম নয়। এর প্রবক্তা আমি।

দুই

পোস্ট মডার্নিজম বলে (যে) কোনো কথারই ধ্রুব অর্থ নেই। সময়, কাল এবং অনুষঙ্গ ভেদে অর্থের ভেদ ঘটে। কাঠুরিয়া গাছটির দিকে তাকিয়ে দেখল কাঠ। পাখিরা গাছকে বৃক্ষ বলে জানল। পাখি এবং কাঠুরিয়ার কাছে গাছ সমান অর্থ বহন করে না। যে ডোমটি রবীন্দ্রনাথকে পুড়িয়েছিলেন, তিনি তো রবীন্দ্রনাথকে বরাবরই 'লাশ' বলে গেলেন তাঁর ইন্টারভিউতে।
আবার কোনো শব্দই নিরালম্ব নয়। শব্দরা কথা বলে পরস্পর, বাক্যটি তৈরি হয়। তারপর বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ থেকে অধ্যায়, গ্রন্থ। বাক্যটিকে বদলে দাও, শব্দের মানে বদলে যাবে। অথবা একটি শব্দকে একটু অন্যভাবে বোঝ, বাক্যটি বিপরীত অর্থ নিয়ে আসতে পারে।
যেমন নিম্নবর্গের মানুষ চন্দ্রগ্রহণে দেখল : তাদের দেবতা রাহু চাঁদকে ঋণশোধ করতে বলছে।

একজন ঈশ্বরপ্রেমিক এই বাক্যটিকে বুঝতে গিয়ে কয়েকটি সমীকরণ তৈরি করেন :
দেবতা = মঙ্গলময় দেবতা, শুভ
⇒নিম্নবর্গ = রাহু
⇒উচ্চবর্গ = চাঁদ
⇒নিম্নবর্গ উচ্চবর্গকে ঋণশোধ করতে বলছে
⇒ইনভাসিন, বিদ্রোহব্যঞ্জক
নাস্তিকের দেবতা নেই। তাই তাঁর কাছে
দেবতা = দানব, অশুভ
সমীকরণ একের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাকি সমীকরণগুলো উল্টে গেল। দুই নম্বর সমীকরণ দাঁড়াল
নিম্নবর্গ ≠ রাহু
অর্থাৎ নিম্নবর্গ = চাঁদ
অতএব, উচ্চবর্গ = রাহু
⇒উচ্চবর্গ নিম্নবর্গকে ঋণ শোধ করতে বলছে
⇒নিম্নবর্গের ভয়।
নাস্তিক শুধুমাত্র একটি শব্দ (দেবতা) কে ভিন্ন অর্থে বুঝল এবং বাক্যটি উল্টে গেল। এইভাবে একটি শব্দের মানে বদলে দিয়ে যেমন বাক্যটির মানে উল্টে দেওয়া যায়, তেমনিভাবে একটি গ্রন্থও বদলে যেতে পারে যদি তার কয়েকটি সংবেদনশীল শব্দ এবং বাক্য ভিন্ন অর্থ ধারণ করে। যেহেতু বাকি শব্দ এবং বাক্যগুলি ওই সংবেদনশীল বাক্য এবং শব্দগুলোকে অবলম্বন করেছিল, তারাও বদলে যায়, গ্রন্থটির প্রতিটি লাইন পুনর্লিখিত হতে থাকে যতক্ষণ না একটি গ্রন্থ থেকে আর একটি গ্রন্থ বেরিয়ে আসে। এইভাবে গ্রন্থ থেকে গ্রন্থের জন্ম হয়। একে বলে ডিকনস্ট্রাকশন। গ্রন্থই গ্রন্থের লেখক। গ্রন্থকার একটি মায়ামাত্র। দি অথর ইজ ডেড।
আমি ডিকনস্ট্রাকশনের কোনো তত্ত্ব রাখব না। ডিকনস্ট্রাকশন কোনো তত্ত্ব নয়, একটি প্রাকটিস। আমি একমুষ্টি ধূলি থেকে তৈরি করতে পারি শহর, মরুভূমি বা পদ্মফুল। আমি রবীন্দ্রনাথকে সন্দীপনি করতে পারি, সন্দীপনকে রাবীন্দ্রিক। আমার চারপাশের সমবেত লেখকেরা এবং গ্রন্থগুলি মায়ামাত্র। লেখক নেই গ্রন্থ নেই জ্ঞানী নেই অজ্ঞ নেই ঈশ্বর নেই।
আসল কথা হল অনুষঙ্গ। অনুষঙ্গ বদল কর, অর্থও বদলে যাবে, গ্রন্থটির অর্থ। গ্রন্থটির কয়েকটি সংবেদনশীল শব্দ যে বিশেষ অর্থ বহন করে, তাও তো অনুষঙ্গেরই জন্য। তারাই সুখী যারা তাদের পরিজনদের নিয়ে একটি বিশেষ অনুষঙ্গে বাঁচে। তাদের কাছে সবকিছু একটিই অর্থ বহন করে। এরা হল সুখী ব্যাঙ। কুয়োর ভিতরই দেখেছে বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড : ঈশ্বর।

আমাদের ব্যক্তিগত কুপ নেই, আকাশের নিচে আমাদের ঘর। ঝড়ে, বৃষ্টিতে, মাস্তানের দাপটে আমাদের ঘর ভেঙে যায়। ভাঙা টুকরোগুলো জড়ো করি, আবার তৈরি হয় ঘর। ঘর থেকে ঘর। যাযাবর আমরা।

তিন

ফলত কোনো শব্দই নির্দিষ্ট এক অর্থ বহন করে না আমাদের জন্য। এমনকি ডিকনস্ট্রাকশন শব্দটিও। ইংরেজি সাহিত্যের দিদিমণি গায়ত্রীদি যেভাবে ডিকনস্ট্রাকশন বুঝবেন সেইভাবে আমি কি বুঝতে পারি, অর্থনীতির একজন ছাত্র? আমি অর্থনীতির তাত্ত্বিক প্রাকটিসের অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে ডিকনস্ট্রাকশন বুঝি। অর্থনীতিতে আমরা তাত্ত্বিক মডেল তৈরি করি। তারপর মডেল থেকে আর একটি মডেল, একটি প্রবন্ধ থেকে আরও প্রবন্ধ। কোনও প্রবন্ধেরই নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই আমাদের জন্য।
প্রাথমিক শর্তগুলো বদলে দাও। প্রবন্ধটিও বদলে যাবে। যাঁরা এই কাজ ভাল করতে পারেন, তাদের বলা হয় বড় অর্থনীতিবিদ।
আসলে সব শাস্ত্রেই এটি একটি চালু রীতি, এমনকি সাহিত্যেও। সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একবার আমাকে বলেছিলেন, 'নাউন আর ভার্বগুলোকে ধর। 'স্মৃতি তুমি বেদনা' এই কথাটির কোনো মানে হয় না। (কিসের স্মৃতি? তুমিই বা কে? আর বেদনাই বা কি?)।' অর্থাৎ সন্দীপন চাটুয্যে গদ্যরচনার একটি মডেল দিলেন। প্রশ্ন : এই মডেল থেকে কি আমরা আর একটি মডেল তৈরি করতে পারি? অথবা : মডেলটির ভিতরেই কি আরও অনেক মডেল লুকিয়ে (নিহিত) আছে? আমি কথাটিকে এইভাবে বুঝলাম যে তুমি স্মৃতি / বেদনা শব্দগুলি ব্যবহার করতে পার, তবে তার অ্যাসোসিয়েশনও রাখবে যাতে এই শব্দগুলিকে শনাক্ত করা যায়। অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং কংক্রীটের সমন্বয়ে আর একটি গদ্যশৈলী তৈরি করা যায়। মহৎ গদ্যকারেরা (সন্দীপন, রাঘব) গদ্যরচনার একটি মডেল অনুসরণ করেন, যার ভিতরেই থাকে অসংখ্য মডেল। কেউ-কেউ এই মডেলগুলি দেখতে পান। তাঁরা সাহিত্যিক। সাহিত্যিক ভাবেন, আমি গদ্যরচনার একটি ঘরানা সৃষ্টি করলাম। মৃদু হেসে বলার : ভুল। সবকিছুই ছিল। কেউ কেউ লক্ষ করে, বাকিরা করে না।
সচেতনভাবে মডেল থেকে মডেল তৈরি করার কাজকে বলে ডিকনস্ট্রাকশন।

চার

অর্থাৎ ডিকনস্ট্রাকশন হল না-এর মাধ্যমে একটি গ্রন্থ বা মডেল বোঝা। আমার সামনের এই টেবিলটি— এর কি কোনও মানে আছে? টেবিলটিকে আমি একাধিক না-এর মাধ্যমে বুঝি : যেমন, টেবিলটি চেয়ার নয়, পেন নয়, কালি নয়, মানুষ নয়

ইত্যাদি। এইভাবে প্রতিটি শব্দই অসংখ্য না-কে বহন করে, যারা শব্দটিকে শনাক্ত করে। হেগেল বলবেন যে এইভাবে টেবিলটিকে আমরা কোনোদিনই বুঝব না। হঠাৎ একদিন কেমনভাবে যেন (অ্যানালিসিস এবং সিনথিসিস সহযোগে) টেবিলটিকে আমরা টেবিল হিসেবে বুঝি। হেগেল রিভিলেশনে বিশ্বাসী। আমরা নই।

অতএব, আমরা না-এর ভিতর দিয়েই টেব্‌ল বুঝব : টেবিল চেয়ার নয়, পেন নয়, মানুষ নয়। এইভাবে টেবিল, চেয়ার, পেন এবং পেনহাতে মানুষটি এবং তাদের সকলকে ঘিরে যে শূন্যতা (স্পেস), এক সামগ্রিকতা তৈরি করে। এই সামগ্রিকতার অংশ হিসেবেই টেবিল, চেয়ার এবং কলম তাদের অর্থ বহন করে।

এসব কিছুই নতুন নয়। হেগেল বলেছিলেন, মার্কসও। শুধু সামগ্রিকতা যে সবসময়েই ভঙ্গুর তাঁরা মানেন নি।

আমাদের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সামগ্রিকতা নেই। (আকাশের নিচে আমাদের ঘর)। তাই টেবিল, চেয়ার, কলম সবকিছুই আমাদের জন্য অনুষঙ্গ ভেদে ভিন্ন অর্থ নিয়ে আসে। (লেখকের হাতে কলম এবং একজিকিউটিভ বা বানরের হাতের কলম কি এক?) আবার টেবিল উল্টে যায়; অনিবার্যভাবে সামগ্রিকতার পরিবর্তন ঘটে। ডিকনস্ট্রাকশনের প্রথম ধাপ হল এই টেবিল ওলটানো। অতএব,

এক : টেবিল ওলটাও (ইনভার্সান)। প্রতিটি গ্রন্থেই কয়েকটি সংবেদনশীল শব্দ / বাক্য থাকে। তাদের অর্থ উল্টে দাও। যেমন আমরা এই প্রবন্ধের শুরুতেই দেবতাকে উল্টে দানব করেছিলাম। আর সবকিছুই তখন কেমন পাল্টে গেল (ডিসপ্লেস্‌ড হল।)

দুই : সবসময়ে এইরকম টেবিল ওলটানোর দরকার নেই। একটি গ্রন্থকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাও এবং তাকে ক্রমাগত প্রশ্ন (ইন্টারোগেট) করতে থাক, তারই অনুষঙ্গের ভেতর থেকে, প্রাথমিক শর্তগুলো মেনে নিয়ে। তখন দেখা যাবে গ্রন্থকার একজন খুনী; অনেক সম্ভাবনাকে খুন করেই গ্রন্থকার তাঁর ভাবনাগুলোকে একটি বইএর আকার দিতে পেরেছেন। খুনী যেমন চিহ্ন রেখে যায়, গ্রন্থটির লেখকও তাঁর হত্যাকাণ্ডের সংকেত রাখেন। ইন্টারোগেশনের সামনে পড়ে লেখক পিছু হঠতে থাকেন, তখন তিনি এক খাদের কিনারে, তারপর তিনি একসময় টুপ করে খাদের ভিতর পড়ে যান, শুধু বাতাসে বইটির পাতাগুলো উড়তে থাকে, জড়ো হয়, আবছা হয়ে আসে, অন্য শব্দের জন্ম হয়, অন্য গ্রন্থ। এমনিভাবেই মার্কস হেগেলকে নিয়ে গিয়েছিলেন খাদের কিনারে, তাঁর ক্যাপিটালের প্রথম অধ্যায়ে। ভালমানুষ আলথুসার বোঝেন নি।

পাঁচ

আমার নাম অজিত চৌধুরী, কম কথায় এ সি। আমি তোমাদের হিস্ট্রি অফ ইকনমিক

থট পড়াব।

বিষয়টি পড়তে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখতে হবে : হিস্ট্রি অফ ইকনমিক থট হল সোনার পাথরবাটি। ইতিহাস নেই, অর্থনীতিও নেই। অতএব, আমি তোমাদের হোঁৎকা টেক্সট বুক লেখক শুম্পিটারের মতো প্লেটো থেকে বর্তমানে আসব না। আমরা বর্তমান থেকে মার্কস→ রিকার্ডো, স্মিথ → ফিজিওক্র্যাট কেনে এবং ইংল্যান্ডের পেটি → মার্কেনটাইলিজম এই চেইন অনুসরণ করব। অথবা আমরা যে কোনো জায়গা থেকেই শুরু করতে পারি। সবকিছুই আছে। বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ, আমরা প্রাক স্মিথ অর্থনীতিবিদ পেটি থেকে শুরু করতে পারি। পেটির লেখা গ্রন্থ লাইব্রেরিতে নেই এটি একটি বাজে কথা। আছে। স্মিথের ওয়েলথ অফ নেশনের ভেতরেই আছে পেটির গ্রন্থটি। অতএব, তোমাদের প্রথম কাজ হবে স্মিথ থেকে শুরু করা। স্মিথ পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে যে ভদ্রলোক ছিলেন খুনী। তিনি পেটিকে খুন করে পিতা হয়ে বসে আছেন। কিন্তু তিনি যত বুদ্ধিমানই হোন না কেন খুনের চিহ্নগুলো সব কিন্তু তিনি মুছে ফেলতে পারেন নি। আমরা এই খুনের চিহ্নগুলো শনাক্ত করে পেটির গ্রন্থটি উদ্ধার করব। তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে পেটিই আমাদের পিতা : পেটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদে ইংল্যান্ডের বিবর্তনের সময়ের হত্যাকাণ্ডগুলির বর্ণনা করেন তাঁর গ্রন্থে। যেহেতু পেটি ছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের দর্শক এবং সাক্ষী, মাফিয়া নেতা স্মিথ তাঁকে খুন করেন। (খুনী স্মিথকে চিনে নাও)।

অতএব, পেটিই হলেন আমাদের পিতা। আমরাও আজ এই হত্যাকাণ্ডের নীরব সাক্ষী। (ভারতবর্ষ রেসের মাঠ মুৎসুদ্দি বেণের)। অতএব, আমরা পেটিকে পিতা করব। মিছে কথা বলে লাভ নেই— আমরা বাস্টার্ড, আমাদের পিতা নেই। অতএব, সামাজিকতার জন্য কোনো এক পিতার জন্ম দেব। পুরোই পিতার জনক।

অতএব, দেখ, বেশি রেফারেন্স পড়বার দরকার নেই। যে কোনো একটি বই পড়লেই চলবে। কেননা একটি গ্রন্থের ভেতরেই আছে সকল গ্রন্থগুলি। বেশি রেফারেন্স পড়ে বোকারা। কেন বেশি পড়বে ? দেখ, বাইরে সকাল, মিষ্টি শীতকালের রোদ, সাইবেরিয়া থেকে পাখিরা ফিরে আসছে আমাদের এই প্রাচীন জলাভূমিতে, কি হবে লাইব্রেরিতে গিয়ে।

অতএব, একটি বই-ই পড়। স্মিথের ভেতরেই তোমরা পাবে মার্কসকে। তারপর ক্যাপিটাল গ্রন্থটি নিজেই লেখ। এতে একটি সুবিধা আছে : মার্কসকে কেউ অবসোলিট বলতে পারবে না। আর যদি গোড়া থেকেই শুরু করতে চাও তো বেদ থেকে শুরু করতে পার। ঋগ্বেদ হল ইকনমিক অ্যানথপেলজির প্রথম টেক্সট। আমার Sa(va)ge Mind গ্রন্থে এ বিষয়ে আমি বিশদ আলোচনা করেছি। দেখ সাহেবদের বজ্জাতি, লেভি স্ট্রাউস Savage Mind লিখেছেন : Sa(va)ge ছেড়ে Savage, ফরাসি মদ ছেড়ে ধেনো। ভাল করে Sage-দের লেখাগুলো পড়। Savage-রা কোন

চুড়োয় উঠতে পারে বুঝবি। দেখ তো, ঘণ্টা বেজে গেল। আমি বরাবর দেখেছি ক্লাসটা শুরু করতে না করতেই ঘণ্টা বেজে যায়।

ছয়

অতএব, লেখক নেই, গ্রন্থও নেই। বই লেখার দিন শেষ হল।

সুতরাং আর লেখক বলে কেউ রইল না। দি অথর ইজ ডেড। 'আমি লিখি' ভাবাটা আদপে হল এক গ্রাম্যতা। যেমন চাষি ভাবে ফসলটি সেই তৈরি করেছে; চাষি বীজ বুনেছে, ফসল কেটেছে, এইবার চাষি-বৌ পাখা দিয়ে তাকে হাওয়া করবে। এটা ছেলেমানুষী।

গ্রামের তাঁতি ঠিক এরকম ভাবে না; সে জানে যে তুলোটা তাকে চাষিই দিয়েছে। তবে তুলো থেকে কাপড়—এটা সে, একটি তাঁতি, করেছে। এটা হল পরিশীলিত গ্রাম্যতা।

আসলে লেখক লেখেন না; একটা লেখা লেখকের মধ্য দিয়ে প্রতিসারিত হয় মাত্র। প্রতিসারিত, অর্থাৎ প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত নয়। যেমন আমার এই কথাগুলো প্রতিসারিত হয়ে পড়ছে তোমার চোখে, মুখে, তোমার মুখের মাংস ও চামড়ার রঙ বদলে যাচ্ছে, যেন দিগন্তশেষের শেষ আলো এসে পড়েছে তোমার মুখে, অথবা ঊষাকালে ফুল তুলছ তুমি। (কেন রোজ ফুল তুলতে যাও, তুমি?)

আমি যে চিঠি লিখি তোমাকে তার মানে আমি জানি না। আমার জাগরণ কাটে এক স্বপ্নের সন্ধানে। রাতে কি যেন এক স্বপ্ন দেখেছিলাম: গোয়ালঘরের দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন চলে গেল, তুমি বললে 'উই, দেখ উড়োজাহাজ', আরও কি সব বলছিলে যেন তুমি, আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি আমার স্বপ্নটিকে লিপিবদ্ধ করি। এ স্বপ্নের মানে কি ছাই, আমি জানি? তুমি যেমন খুশি মানে করে নাও।

তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলব না। স্বপ্নটিকে লিখতে গিয়ে এদিক ওদিক থেকে চুরি করতে শুরু করলাম আমি। চুরি করতে গিয়ে দেখি, কি আশ্চর্য। ওগুলো তো সবই একসময় আমার ছিল। কোনটা যে আমার, কোনটা যে ওদের আমার গোল বেঁধে গেল। আমি সবকিছুই তোমাকে পাঠালাম। তুমি বুঝে নাও।

এতদিনে তুমি নিশ্চয় বুঝে ফেলেছ আমার সব চিঠি আসলে একটাই চিঠি। আসলে দুটো চিঠি লিখবার ক্ষমতা আমার নেই। অথবা দ্বিতীয় চিঠি কি লেখা হয়েছে, আজও? কে যেন, কবে, একটা, চিঠি লিখেছিল? পোস্টম্যান ঝোলাকাঁধে ঘুরে বেড়ায় শুধু এক প্রাচীন চিঠি নিয়ে, দ্বার থেকে দ্বারে। বলতে আপত্তি নেই যে কায়দাটি আমি চুরি করি বাঙলার দ্বিতীয় পোস্ট মডার্নিস্ট কবি উৎপল বসুর কাছ থেকে।

'নিরক্ষর বেশ্যাদের জন্য চিঠি লিখে যাচ্ছি।'

দিনশেষে একবার যাব তোমার ঘরে, একটুক্ষণ বসতে দিও, তোমায় ঘরের ধুলো না আনলে যে আমার পুজো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সাত

সোজা কথা সোজাভাবে বলাই ভাল : সাহিত্য (উপন্যাস / গল্প / কবিতা) বলে কিছু নেই। যেমন ইতিহাস নেই, সাহিত্যও নেই। ঐতিহাসিকরা যে মাথামোটা একথা আজ পৃথিবীর সর্বপ্রান্তেই স্বীকৃত। সাহিত্যিকেরা কিন্তু এখনও কিছু সম্ভ্রম (নোবেল প্রাইজ, পরস্ত্রী প্রেম) পান।

সাহিত্যিকেরা মানুষের মনের গভীর আনাচ-কানাচগুলোর খোঁজ জানেন, এটা স্রেফ একটা গুজব ; এ কাজটা প্রফেশনাল সাইকোঅ্যানালিস্ট অনেক ভাল পারেন। আর সমাজ ব্যাপারটা সাহিত্যিকের চেয়ে সমাজবিজ্ঞানী ভাল জানবেন এটাই তো স্বাভাবিক। বস্তুত সাহিত্যিকের কারবার শব্দ নিয়ে। শব্দ, শব্দানুভূতি এবং তারই অবজেক্ট হিসেবে আসে সমাজ, মরুভূমি, ফুল, মানুষ-মানুষী।

একটি বই-এর সঙ্গে এক বৃদ্ধের প্রেম, এই নিয়ে কি কোনও উপন্যাস লেখা যেতে পারে ? বৃদ্ধ বইটি পড়ছেন, বুঝছেন, নোট করছেন, সমান্তরালভাবে কতগুলো কথা আসছে তাঁর মনে, কিছু অনুভূতি, বন্ধুরা বুঝছে না, ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বৃদ্ধের মনে পড়ছে তাঁর ছেলেবেলার প্রেমের কথা, একজিসটেনসিয়ালিজম নিয়ে অতি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিল সে, গালে হাত দিয়ে শুনেছিল তনুকা, তনুকা এখন নিউইয়র্কে, বৃদ্ধের খুব কষ্ট হচ্ছে, খুব ইচ্ছে করছে তার মনের কথা বলার, এমন সময় বালক ছেলেটি ছুটতে ছুটতে এল, বৃদ্ধের চোখ চকচক করে উঠল, আবার যাবে সে সমুদ্রে, মাছ ধরতে, আর সর্বকিছুর শেষে এক শূন্য আর এক উজ্জ্বল সোনালি সিংহ এই নিয়েই তো হেমিংওয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, লিখেছিলেন না ?

বিশ শতকের শেষে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীজুড়ে সীমানার অদলবদল হচ্ছে : বার্লিনের দেয়াল ভেঙে পড়ল, দেয়াল উঠল প্রাচীন রাশিয়ার রাজ্যগুলিতে। তেমনি করেই দেওয়াল ভেঙে পড়ছে সাহিত্য, দর্শন, সমালোচনা, এবং সমাজ বিজ্ঞানের। সমালোচক এবং সাহিত্যিকের মাঝ বরাবর কি কোনও লাইন টানা যায় ? আমি যখন মার্কসের ক্যাপিটাল গ্রন্থের সমালোচনা করি, তখন তো আসলে আমি আর একটা দাস ক্যাপিটালই লিখি। লিখি না ? তাহলে আমি কি ? লেখক না সমালোচক ?

আবার এই কাজ করাকালীন তো মাস্তানেরা আমাকে লাঠি নিয়ে মারতে আসে, আমি আহত হই, আমার চোখের কোণ দিয়ে রক্ত পড়ে (রক্ত না জল ?) চারপাশে পড়ে থাকে আমার পকেটের খুচরো পয়সাগুলো আর দুঃখ, সেই দুঃখ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র, আমার লেখায়। তখন আমি কে ? সমাজবিজ্ঞানী কি ?

ন্যাশনালিজমের দিন শেষ হল, এখন মালটিন্যাশনালের দিন। এক প্রাচীন দৈত্য এসে

ভেঙে ফেলছে সব, আমাদের ঘরবাড়ি, অসূর্যম্পশ্যার আব্রু গেল, রাইট অফ ফার্স্ট নাইট, আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে জেনে ···কি হবে আর দেওয়াল তুলে, সাহিত্যিক ?

অতএব, এখন যে লেখাগুলো হবে তার লেবেল আমি জানি না। (তুমি সাহিত্য করছ না, আবার সমাজবিজ্ঞানও লিখছ না, তাহলে তুমি কি করছ ?) এক আদিম স্যাভেজ আমি, বিকোলার, ম্যাজিসিয়ান, চারপাশের কাঠ, খড় যা কিছু পাই সবকিছু মিলিয়ে একটা কিছু খাড়া করে দিই আমি, মাঝখানের শূন্যগুলো জুড়ে থাকে ছেঁড়া ছেঁড়া উপকথা, তার মানে আমি জানি না, তোমরা যেমন খুশি মানে কর অর্থাৎ আর একটা কিছু দাঁড় করাও। এইভাবে লেখার কিছু সুবিধা আছে। যেমন লেখাটিতে যখন ইমোশানের মাত্রা চড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ লেখাটি প্যানপেনে হয়ে যাচ্ছে তখন কয়েকটি প্যারাগ্রাফ দর্শন বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। মাঝখানে রিলিফ হিসাবে প্রিয় নারীর সঙ্গে হেলিকপ্টার ভ্রমণের বর্ণনা রাখা যায়। ফলত ভাষাও একটি আলাদা মাত্রা পাবে। সাহিত্যিকদের ওয়ান ডাইমেনশনাল ভাষার বদলে নানা বিষয়ের সংযোগে ভাষায় অতি সহজ এবং সাবলীল এক ওঠানামা আসবে। এইভাবে আমরা একই স্পেসে সমুদ্র, অরণ্য এবং পাহাড় নিয়ে আসতে পারি। এইভাবে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের ভাষার দেওয়ালগুলো ভেঙে দেব। তখন দেখা যাবে যে বাঙলা, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ ভাষার সীমারেখাগুলি সরে গেল। আমার লেখা খুব সহজেই স্প্যানিশে অনূদিত হয়ে গেল, ল্যাটিন আমেরিকার তরুণ-তরুণীরা আমার লেখা পড়ছে।

আমাকে একটি ভাষা দাও যা নেশন ভাঙতে পারে।

আট

পোস্ট মডার্নিজমের মূল প্রতিপাদ্য হল :

এক, ঈশ্বর নেই। অতএব নেশন নেই পার্টি নেই ফ্যামিলি নেই। না-ই সত্য। আর সব কিছু মিথ্যে।

দুই, আবার যা মিথ্যে তা অসত্য নয়। মিথ্যে একটি তাত্ত্বিক ক্যাটিগরি। মিথ্যে হল যে শূন্যের পর তৈরি ঘর, তাসের। উজ্জ্বল হরতন ইস্কাপন রুহিতনের সাহেব বিবি গোলামেরা ঘুরে বেড়ায়। একটু ফুঁ দাও, ওদের ঘর ভেঙে পড়বে। এই ফুঁ দেওয়ার পদ্ধতিকে বলে ইন্টারোগেশন।

তিন, তখন তুমি এই তাসগুলি দিয়ে আর একটি ঘর করতে পার যার নাম ডিকনস্ট্রাকশন। এর জন্য আগের ঘরটিকে সম্পূর্ণ ভাঙার দরকার নেই। কয়েকটি সংবেদনশীল অংশকে ভাঙলেই

নয়

নেশন নেই রাজা নেই ঈশ্বর নেই, ভেঙে পড়ছে জব চার্নকের কলকাতা, গঙ্গার বুক দিয়ে বয়ে যায় গলিত অ্যাসিড, টিন, শব, টেকচাঁদ, বেশ্যাদের রাত, রবীন্দ্রনাথ। আমি কপিল সাংখ্যকার : একবার চোখ মেলে তাকালাম, সম্রাট সগরের সন্তানেরা ভস্ম হল। সেই থেকেই তো সাগর মেলার শুরুঃ। সাগর মেলা আজও চলে, দেখ। এশিরিয়া ধুলো আজ, ব্যাবিলন ছাই হয়ে গেছে।

আমার মনে পড়ছে সব, আমি জাতিস্মর। সপ্তদশ অশ্বারোহী যখন এই বঙ্গভূমি আক্রমণ করে, তখন তাঁদের দু-হাত তুলে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল যে বৌদ্ধ ভিক্ষুক, সে তো আমিই। আবার সিরাজের কবর খুঁড়তে খুঁড়তে হো হো করে হেসে উঠছিল যে ডোমটি সেও তো আমি। আজ আর একবার আমাকে বল্লাল সেনের সন্তানসন্ততিদের শেষ কৃত্য করতে দাও।

সত্তরের রাগী যুবকেরা বেঙ্গল রেনেশাঁসে দেশজ কিছুই দেখতে পান নি, এটা দুঃখজনক, সরলীকরণ। বেঙ্গল রেনেশাঁসের প্রায় সবটাই দেশজ, ইংরেজ নিমিত্ত অর্থাৎ মাধ্যম মাত্র। ইংরেজের হাত ধরে বল্লাল সেনের সন্তানসন্ততিরা ক্ষমতায় ফিরে এল। পাশ্চাত্য দর্শনের ডিজেনারেশনের শুরুঃ সক্রেটিস থেকে, প্রাচ্যে ন্যায়শাস্ত্রে। ইংরেজ সহজ এবং সাবলীল-ভাবে এই দুই অবক্ষয়কে মেলাল। ফল : বেঙ্গল রেনেশাঁস। ভাটপাড়ার নৈয়ায়িক হলেন সাহিত্যসম্রাট। সেই থেকে অফিসিয়াল সাহিত্যের জায়গীরদারি মোটামুটিভাবে ভাটপাড়াতেই আছে। মাঝখানে রবিঠাকুর, কেমনভাবে জানি না, একটু নিমাইভক্ত হয়ে পড়লেন এবং ফলত পেলেন নোবেল প্রাইজ। তাও তো তিনি গদাই থেকে কিছুই চুরি

চলবে।

চার, সকল ঘরই যখন মিথ্যে ; একটি বই-ও অনিবার্যভাবে একটি মিথ্যে। বই-বলে কিছু নেই। অতএব লেখক বলেও কিছু নেই।

পাঁচ, অতএব ঈশ্বরও মিথ্যে। ঈশ্বর অর্থাৎ যে কোনো ধরনের আদর্শ : সাম্য, স্বাধীনতা, প্রেম, সোস্যালিজম।

ছয়, অর্থাৎ পোস্ট মডার্নিজম হল দৈত্যরাজের দর্শন। দৈত্য অর্থাৎ ক্ষমতা। অতএব, দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হল ক্ষমতা বিষয়ক প্রতিপাদ্যগুলি।

সাত, দৈত্যরাজ ঈশ্বরকে নির্বাসিত করে খুদে দেবদেবীদের মুক্ত করে দিল। বলা হল যে যার ব্যক্তিগত দেবদেবীদের পুজো

করেন নি। মডার্নিজমের দিন শেষ, অতএব অনিবার্যভাবে খসে পড়ছে জব চার্নকের কলকাতার ইঁট, খড়, নথিপত্র, মিউজিয়াম, মমি, কলকাতা ইউনিভার্সিটি, হিজড়েদের গান, বালিগঞ্জ, ব্রাহ্ম, সি পি আই, কলকাতার সুমহান ঐতিহ্য। শুধু পৌরাণিক কলকাতার ডাকাতে কালী জিভ বের করে হাসছেন, তাঁর সন্তান আমরা, শৃঙ্খল ছাড়া আমাদের আর কিছুই হারাবার নেই।

অতএব, বল্লাল সেনের কলকাতার অবিচুয়ারি লেখা শুরু হোক। আলোচনার সূত্রপাত অবশ্যই অধ্যাপক সরোজ দত্তের লেখা পত্র থেকে— আমার সকল আইডিয়াই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। শশাঙ্ক : এই নামটি আমার চোখের সামনে এক তেপান্তরের মাঠ খুলে দেয়। মূর্তি ভাঙার আর কোনো প্রয়োজন নেই, মূর্তিগুলোকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাও, ইন্টারোগেট কর, মূর্তিগুলো পিছু হঠতে থাকবে, তারপর এক সময় খাদের ভিতর পড়বে টুপটাপ : রক্তপাতহীন কালচারাল রেভল্যুশন। আসলে এদের দিন শেষ। অতিব্যবহৃত গণিকারা মাস্তানের মতো মাফিয়াসর্দার এইবার এদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে স্বয়ং, নিজহস্তে, গর্তে। অর্থাৎ এইবার মূর্তি আক্রমণ করলে পুরস্কার পাওয়া যাবে, নিউইয়র্ক থেকে কনফারেন্সের চিঠি আসবে, আর তখন ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার প্রাচীন বঙ্গজ মুৎসুদ্দিরা কি চেঁচাতে সাহস পাবে, কেননা তখন তো নব্য মুৎসুদ্দিরা এসে গেছে, এক মুৎসুদ্দিপনা থেকে আর এক মুৎসুদ্দিপনা—এই হল অ্যাকাডেমিক সোস্যাল সাইন্স।

আসল কথা : কলোনিয়াল পাওয়ার কিভাবে কাজ করে? কিভাবে তাঁর মতাদর্শগত প্রভুত্ব স্থাপিত হয়? মতাদর্শগত প্রভুত্ব স্থাপনে এজেন্ট বা কোলাবোরেটর কারা?

করতে পারে। এইভাবে দৈত্যরাজ তার মতাদর্শগত প্রভুত্ব স্থাপন করে। সহজ কথায় : পোস্ট মডার্নিজম বলে যে মানুষ নানা-রকমভাবে বাঁচতে পারে ; ইউরোপই একমাত্র মডেল নয়।

আট, ফলত অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে মালটিন্যাশনালগুলির এক নতুন সেতু তৈরি হল। মডার্নিজম নেটিভদের বুঝত না। পোস্ট মডার্নিজম নেটিভের অর্থ সৃষ্টি করল— নেটিভকে তার মতো ভাবে বুঝল। অতএব, পোস্ট মডার্নিজম কোনো এক ফ্যাশন নয়, এটা থাকবে বেশ কিছুদিন, দৈত্যরাজের দর্শন হয়ে।

অবশেষে, বিংশ দশকের শেষে এসে ঈশ্বরের মৃত্যু হল। ঈশ্বর, অবশ্যই, মানুষের শত্রু ছিল। কিন্তু ঈশ্বরকে হত্যা মানুষ করে নি, করেছে দৈত্যরাজ,— মানুষের আর এক শত্রু। কিন্তু ঈশ্বরের

কলোনিয়াল মাইন্ডের স্প্রেসিফিসিটি কি ? অর্থাৎ এটি একটি তাত্ত্বিক রিসার্চ প্রজেক্ট। পোস্ট মডার্নিজম একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দেবে ; বেঙ্গল রেনেশাঁস এই তাত্ত্বিক কাঠামো প্রয়োগের এক অতি উর্বর ক্ষেত্র। তখন দেখা যাবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিরা দাসত্বের যে উজ্জ্বল কাঠামো তৈরি করেছিল তার একটি আন্তর্জাতিক অর্থাৎ আমেরিকান মার্কেট আছে এবং এই মার্কেটের সাহায্যে বাঙালি একুশ শতাব্দীতে আর একটি নবজাগরণ ঘটাতে পারে। বাঙলা তার লোহা, কয়লা, তেল এবং এই লিপিবদ্ধ দাসত্বের কালচার বা ডিসকোর্সের সাহায্যে বিশ্বের দরবারে একটি স্থানও পাবে। এইভাবে তৈরি হবে একঝাঁক নতুন পম্পাস ভৃত্য : প্রাতিষ্ঠানিক গবেষক। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, অংক জানে কম্পিউটার জানে ইংরেজি জানে ফরাসি জানে উজ্জ্বল ছেলেরা ঘুরে বেড়ায় নগরীর রাজপথে, তাঁদের জন্য কাজ নেই, কাজ নেই তাই প্রেম নেই, অতএব ড্রাগ আছে নিষিদ্ধ যৌনবিহার আছে, অথচ বিপ্লব নেই, বিপ্লব তা শেষ হয়ে গেছে কবে, মার্কসকে আমরা খুন করেছি, মার্কস দীর্ঘজীবী হোক। এইখানে কোন্ স্বাধীন গোচারণ ক্ষেত্র তুমি তৈরি করবে, লেখক ? এখনই তো সময় তুমি তোমার নির্বাচিত কমরেডদের নিয়ে অ্যাবস্কন্দ করবে। গুপ্ত গহ্বর তৈরি কর, হারি আপ, কেননা কিছুক্ষণ বাদেই তো নগরীর উজ্জ্বল আলোগুলো জ্বলে উঠবে কলকাতায় আর লোডশেডিং নেই কলকাতা এখন কল্লোলিনী তিলোত্তমা এ কোন বেশ্যার সাজে সেজেছ কলকাতা চতুর্দিকে দালাল এবং পিম্প পরিবেষ্টিত আলোগুলো জ্বলে উঠেছে মহানগরীর পথ দিয়ে চলে দৈত্যরাজের রথ এখানে যে কোনো অ্যাকশান মানেই তো দৈত্যরাজকে হেইল করা। দৈত্যরাজ দীর্ঘজীবী হোক, আমি

মৃত্যু নিয়ে মরাকান্না আমি তুলি না। জন্ম হলে, মৃত্যু হবে। ঈশ্বরের জন্ম হয়েছিল, তাই মৃত্যু হল। দৈত্যরাজের সঙ্গে লড়তে হবে। মারতে না পারি, সামাল তো দিতে পারব। আপাতত লড়াই হবে দৈত্যরাজের অস্ত্র নিয়ে অর্থাৎ পোস্ট মডার্নিস্টদের ক্যাটিগরির সাহায্যে। এইসব ফুকো, ডেরিডাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাও, ইন্টারোগেট কর, দেখবে ওরা কেমন বাজে বকতে শুরু করেছে। কিন্তু আপাতত এসব কাজ না করাই ভাল। ফুকো ডেরিডার নাম করলেই ঈশ্বরভক্তরা মারতে আসবে। আবার ওরাও তো আমাকে খুব আদর করবে না। অতএব, চুপ কর, চুপ, যতদিন না ঈশ্বর নিয়ে মরাকান্না একটু থিতোয়।

পোস্ট মডার্নিজমকে হেইল করছি।

দেখ, আমি কেমন সাবলীলভাবে দৈত্যরাজকে হেইল করছি, যেমন করেছিলাম সপ্তদশ অশ্বারোহী বা ক্লাইভকে। আমার ঈশ্বর নেই অতএব দেশ নেই স্বাধীনতা নেই, পরাধীনতা নেই, আমার খালি গা, পা পথিকের, টাইম এবং স্পেস অতিক্রম করে আমি হেঁটে চলেছি। দস্যুরা যখন গোচারণ ক্ষেত্র আক্রমণ করেছিল কে লড়াই করেছিল, সে তো আমিই, কে প্রথম আবিষ্কার করে আগুন বা বর্ণমালা, আমি শূন্য, কে তোমরা আমাকে বাঁধবে ? তোমাদের ক্যাটিগরি দিয়ে আমাকে ধরতে যেও না, দেখ চাঁদ উঠেছে, পূর্ণ চাঁদ, জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে আমাদের প্রাচীন পৃথিবী। আজ বুদ্ধপূর্ণিমা।

দশ

আসলে আমার লেখার কোনো মানে হয় না। কে আমি যে লিখব আর তোমরা আমার লেখা পড়বে ? লেখার নিজস্ব জোরের জায়গা থেকেই একটা লেখা পাঠক পায় এটি একটি অতি প্রাচীন বাজে কথা। আমি বড় ঘরের ছেলে নই, আবার সন্ন্যাসীও নই, মদ খাই না, গাঁজা খাই না, আমার ভৈরবী নেই, বন্দুক নেই, শুধু কলম আছে, তোমরা কেন আমার কথা শুনবে ? আমি ব্রুনোর মতো বোকা নই, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে জেনেছি তো এখানেই শেষ, বলতে গেলে লোকে মারতে আসবে, ওসব কথা লোকে গ্যালিলিও-র কাছ থেকে শুনতে চায়, আমার কাছ থেকে নয়। এই তো সেদিন বিশ্বম্ভর কি মারটাই না খেল : রাজা যাচ্ছিল রাজপথ দিয়ে, ও বলে উঠল রাজা ন্যাংটো, লোকজন কি মারটাই না মারল, রাজার সেপাই মারলে তো ভাল ছিল, বিশু বীর হয়ে কলেজে ফিরত, শ্যামশ্রীর কোলে মাথা রেখে শুত। তো, মারল বিশুর বন্ধু-বান্ধব। কি, এমন কথা ! ওরা সবাই দেখছে রাজার পরনে রেশমী কাপড়, আর বিশু বলে কিনা— ওদের ভারি অপমান লেগেছিল, শ্যামশ্রীতো বললই, বিশুদা, এটি তুমি ভাল কাজ কর নি। বেচারা বিশু। মার খেল, বন্ধুদের হারাল, প্রেমিকাও চলে গেল। (নারীকেও নিয়ে যায়।) শহীদ হবার দিন চলে গেছে— ব্রুনো তবু শহীদ হতে পেরেছিল। এসব হল রাম রাজত্ব : নীচু জাতের শম্বুক নিজের মতো পড়াশুনো করছিল, উচ্চবর্ণের সইবে কি করে, তাই প্রচার করা হল যে শম্বুক নাকি শিশুদের সঙ্গে যৌনক্রীড়া করে আর রাম এসে খ্যাঁচাং করে শম্বুকের গলাটা কেটে দিলেন আর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল।

এইসব জানার পর আমি বন্ধুদের আর কিছুই বলি না। প্রিয় গাছ, তুমি নগরীর যুবকদের বলে দিও, রাজার দুটি শিং আছে। □